

# নয়নচারা ॥ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটাসত্তি ময়ূরাক্ষী-রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালোস্রোত কল-কল করে, দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলে ডিঙ্গিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বসহা আশার মতো মৃদু মৃদু জ্বলে।

তবে ঘুমের স্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে: ময়ূরাক্ষী! কোথায় ময়ূরাক্ষী? এখানে তো কেমন ঝাপসা গরম হাওয়া। যে হাওয়া নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসে সে হাওয়া কি কখনো অত গরম হতে পারে? ফুটপাতে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন। কিন্তু দুপুরের দিকে লঙ্গরখানায় দুটি খেতে পেয়েছিল বলে তবু তাদের ঘুম এসেছে-মৃত্যুর মতো নিঃসাড় নিশ্চল ঘুম। তবে আমুর চোখে ঘুম নেই, শুধু কখনো-কখনো কুয়াশা নামে তন্দ্রার এবং যদিবা ঘুম এসে থাকে, সে-ঘুম মনে নয়-দেহে; মন তার জেগে রয়েছে চেনা নদীর ধারে, কখনো কলপনায় কখনো নিশ্চিত বিশ্বাসে, এবং শুনছে তার অবিশ্রান্ত মৃদু কলস্বন, আর দূরে জেলে ডিঙ্গিগুলোর পানে চেয়ে ভাসছে। ভাবছে যে এরই মধ্যে হয়তোবা ডিঙ্গির খোদল ভরে উঠেছে বড় বড় চকচকে মাছে- যে চকচকে মাছ আগামীকাল চকচকে পয়সা হয়ে ফিরে ভারী করে তুলবে জেলেদের ট্যাঁক। আর হয় তো বা, কী হয় তো বা?

কিন্তু ভুতনিটা বড় কাশে। থক্ক থক্ক থ-থ-থ। একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না, কেবল কাশে আর কাশে, শুনে মনে হয় দম বন্ধ না হলে ও কাশি আর থামছে না তবু থামে আশ্চর্যভাবে, তারপর সে হাঁপায়, কাশে কখনোবা কাশে না বটে তবে তার গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ হয় একটানা যেন ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-চাকায় শব্দতুলে সে কোথায় চলেছে যে চলেছেই। তাছাড়া সব শব্দ, নীরবতা পাখা গুটিয়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে আর জমাট বন্ধ ঘনায়মান কালো রাত্রি পর্বতের মতো দীর্ঘ, বৃহৎ ও দুর্লভ্য।

ভুতনিটা এবার জোর আওয়াজে কেশে উঠলো বলে আমুর মনে কুয়াশা। সে ভরা চোখে তাকালো ওপরের পানে-তারার পানে এবং আকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবলো, এই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে চেয়ে দেখতো? কিন্তু সে তারাগুলোর নিচে ছিল ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য আর ময়ূরাক্ষী। আর এ তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েছে শুধু হিংসাবিদ্বেষ, নির্ভরতা, অসহ্য বৈরিতা।

কিন্তু তবু ওরা তারা। তাদের ভালো লাগে। আর তাদের পানে চাইলে কি যেন হঠাৎ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বিপুল বাহু মেলে আসে, আসে। কিন্তু যা এসেছিল, মুহূর্তে তা শূন্য রিক্ত করে দিয়ে গেলো। কিছু নেই। শুধু ঘুম নেই। কিন্তু তাই যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে। নদীতে জোয়ার না ভাটা? মনে হচ্ছে ভাটা, এবং এ ভাটাতে ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে তার। সে ভেসে যাবে, যাবে, প্রশস্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, দূরে, বহুদূরে- কোথায় গো? যেখানে শান্তি-সেইখানে? কিন্তু সেই শান্তি কি বিস্তৃত বালুচরের শান্তি?

তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয়। আর এখানে শহর। মন্তরগতিতে চলা একজোড়া পায়ের আওয়াজ ঘুরে আসছে গলি দিয়ে, এবং নদীর মতো প্রশস্ত এ রাস্তায় সে যখন এলো তখন আমু বিস্মিত হয়ে দেখলো যে লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলছে, আর সে-চোখ হীনতার ক্ষুদ্রতম ও ক্রোধে রক্তবর্ণ। হয়তোবা সেটা শয়তানের চোখ নয়, হয় তো শুধুমাত্র একটা বিড়ি। তাহলে অদৃশ্যপ্রায় কালো শয়তানের হাতে বিড়ি, যেটা দুলছে কেবল তার হাতের দোলার সাথে। শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায় ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন জ্বলে ওঠে। তবে শুধু এই বিস্ময়-ই; ভয় করে না একটু-ওঃ বরঞ্চ সে যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করবার জন্য অপেক্ষমান। তাছাড়া রাস্তার অপর পাশের বাড়িটার একটা বন্ধ জানালা থেকে যে উজ্জ্বল ও সরু একটা আলো রেখা দীর্ঘ হয়ে রয়েছে, সে, আলো রেখায় যখন গতিরুদ্ধ স্তব্ধতা, তখন শয়তানের হাতে আগুন জ্বলতে দেখলে আরো ক্রোধ হয় মানুষের। আগুনটা দুলছে নাতো যেন হাসছে; আমুরা

যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কঁকায়-তখন পথ চলতি লোকেরা যেমন আলাদা অপরিচিত দুনিয়ারকোন অজানা কথা নিয়ে হাসে, এ-ও যেন তেমনি হাসছে। কিন্তু কেন হাসবে? দীর্ঘ উজ্জ্বল সে রেখাকে তার ভয় নেই? জানে না সে যে ওটা খোদার দৃষ্টি-অকম্পিত দ্বিধাশূন্য ঋজু দৃষ্টি? তবু আলো-কণা হাসে, হাসে কেবল, পেছনে কালো শয়তান কালো রঙে হাসে। তা হাসুক, আলাদা দুনিয়ায় হাসুক, কারো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এ-দুনিয়ায়-যে-দুনিয়ায় ঘর ছেড়ে লোকেরা কালো নদীর ধারে ধারে পড়ে রয়েছে ভাটির টানে ভেসে যাবে বলে, যে দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না-দেবে না।

তবু কালো শয়তান রহস্যময়ভাবে এগিয়ে আসছে। শূন্যে ভাসতে ভাসতে যে এগিয়ে আসছে ক্রমশ এসে কী আশ্চর্য, আলো রেখাটাও পেরিয়ে গেল নির্ভয়ে এবং গতিরুদ্ধ দীর্ঘ সে রেখা বাধা দিলো না তাকে। মৃতগতির পানে চেয়ে নদীর বুকে তারপর নামলো কুয়াশা আমুর চোখে পরাজয় ঘুম হয়ে নামলো। পরায় মেনে নেয়াতে-ও যেন শান্তি।

রোদদন্ধ দিন খরখর করে। আশ্চর্য কিন্তু একটা কথা: শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। এখানে মানুষের চোখে, এবং দেশের কুকুরের চোখে বৈরিতা। তবুও ভালো।

ময়রার দোকানে মাছি বোঁ বোঁ করে। ময়রার চোখে কিন্তু নেই ননী-কোমলতা, সে চোখময় পাশবিক হিংস্রতা। এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুটো ভয়ঙ্কর চোখ ধকধক করে জ্বলছে। ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাড়ি কলা ঝুলছে, সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো কলা নয় তো, যেন হলুদ রঙা স্বপ্ন ঝুলছে। ঝুলছে দেখে ভয় করে-নীচে কাঁদায় ছিঁড়ে পড়বে কি হঠাৎ? তবু শঙ্কা ছাপিয়ে আমুর মন উর্ধ্বপানে মুখ করে কেদে ওঠে, কোথায় গো, কোথায় গো নয়নচারী গাঁ?

লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্ছে; রক্ত ছুটছে। যেমন করিম মিয়ার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটেছিল রক্ত। তবে মেয়েটার গলার নিচেটা সাদা, এত সাদা যে মনটা হঠাৎ স্নেহের ছায়ায় ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়বার জন্য খাঁ খাঁ করে ওঠে। মেয়েটি হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেল রক্ত ঝলকিয়ে। কিন্তু একটা কথা: ও কী জানে না-আসলে ও চুল কার। ও-চুল নয়নচারী গাঁয়ের মেয়ে বিয়ার মাথার ঘন কালো চুল।

কিন্তু পথে কতো কালো গো। অদ্ভুত চাঞ্চল্যময় অসংখ্য অগুনতি মাথা; কোন সে অগুনত হাওয়ায় দোলায়িত এ-কালো রঙের সাগর। এমন সে দেখেছে শুধু ধানক্ষেতে, হাওয়ায় দোলানো ধানের ক্ষেতের সাথে এর তুলনা করা চলে। তবু তাতে আর এতে কত তফাৎ। মাথা কালো, জমি কালো, মন কালো। আর আর দেহের সাথে জমির কোন যোগাযোগ নেই, যে হাওয়ায় তারা চঞ্চল কম্পমান, সে হাওয়ায় দিগন্ত থেকে উঠে আসা সবুজ শস্য কাঁপানো সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ হাওয়া নয়: এ-হাওয়া সে চেনে না।

অসহ্য রোদ, গাছ নেই। ছায়া নেই নিচে, কোমল ঘাস নেই। এটা কি রকম কথা: ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসছে অথচ ছায়া নেই ঘাস নেই। আরও বিরক্তিকর- এ কথা যে কাউকে বলবে, এমন কোনো লোক নেই। এখানে ইটের দেশে তো কেউ নেই-ই, তার দেশের যারা বা আছে তারাও মন হারিয়েছে, শুধু গোঙানো পেট তাদের হা করে রয়েছে অন্ধ চোখ চেয়ে।

তবু যাক, ভুতনি আসছে দেখা গেলো। কিরে ভুতনি? ভুতনি উত্তর দিলো না, তার চোখ শুধু ড্যাব ড্যাব করছে, আর গরম হাওয়াটায় জটা পড়া চুল উড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিরে ভুতনি? ভুতনি এবার নাক ওপরের দিকে তুলে কম্পান জিহ্বা দেখিয়ে হঠাৎ কেদে ফেলে ভাঁ করে। কেউ দিলো না বুদ্ধি, পেট বুদ্ধি ছিড়ে যাচ্ছে? কিন্তু একটা মজা হয়েছে কি জানিস, কোথেকে একটা মেয়ে রক্ত ছিটাতে ছিটাতে এসে আমাদের দুটো পয়সা দিয়ে চলে গেল, তার মাথায় আমাদের সেই বিয়ার মাথার চুল-তেমনি ঘন, তেমনি কালো। আর তার গলায় নিচেটা-। ভুতনির গলার তলে ময়লা শুকনো কাদার মতো লেগে রয়েছে। থাক সে কথা। কিন্তু তুই কাঁদছিস ভুতনি, ওরে ভুতনি?

কী একটা বলে ফেলে ভুতনি চোখ মুখ লাল করে কাশতে শুরু করলো। তার ভাই ভুতো মারা গেছে। কোন

নতুন কথা নয়, পুরনো কথা আবার নতুন করে বলা হলো। সে মরেছে; ও মরেছে; কে মরেছে বা কে মরছে সেটা কোন প্রশ্ন নয়, আর মরছে মরছে কথা দু-রঙা দানায় গাঁথা মালা, অথবা রাস্তার দুধারের সারি-সারি বাড়ি-যে বাড়িগুলো অদ্ভুতভাবে অচেনা অপরিচিত, মনে হয় নেই অথচ কেমন আলগোছ অবশ্য রয়েছে। ভুতুনির কান্না কাশির মধ্যে হারিয়ে গেলো। কাশি থামলে ভুতুনি হঠাৎ বলে, পয়সা? তার পয়সার কথাই যেন শুধোচ্ছে। হ্যাঁ, দুটো পয়সা আমুর কাছে আছে বটে কিন্তু আমু তা দেবে কেন? ভুতুনির চোখ কান্নায় প্যাক-প্যাক করছে, আর কিছু কিছু জ্বলছে। কিন্তু আমু কেন দেবে? ভুতুনি আরো কাঁদলো, আগের চেয়ে এবার আরো তীব্রভাবে। তাই দেখে জ্বলে উঠলো। চোখ যখন জ্বলে উঠলো তখন দেহ জ্বলতে আর কতক্ষণ: একটা বিদ্রোহ-একটা ক্ষুরধার অভিমান ধাঁধাঁ করে জ্বলে উঠলো সারাদেহময়। তাতে তবু মন যেন প্রতিহিংসার উজ্জ্বল উপসম।

সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে। বহু অচেনা পথে ঘুরে ঘুরে আমু জানালো যে ও-পথগুলো পরের জন্য, তার জন্য নয়। রূপকথার দানবের মতো শহরের মানুষরা সায়ন্তন গরাভিমুখ-চাঞ্চল্যে খরখর করে কাঁপছে। কোন এক গুহায় ফিরে যাবার জন্য তাদের এ-উগ্র ব্যস্ততা? সে গুহা কি ক্ষুধার? এবং সে গুহায় কি স্তপীকৃত হয়ে রয়েছে মাংশের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তপ? কত বৃহৎ সে গুহা?

অচেনা আকাশের তলে অচেনা সন্ধ্যায় আমুর অন্তরে একটা অচেনা মন ধীরে ধীরে কথা কয়ে উঠেছে। ক্ষীণ তার আওয়াজ, তবু মনে হয় গুহার পানে প্রবাহিত এ বিপুল জলস্রোতকে ছাপিয়ে উঠেছে তা। কী কইছে সে? অস্পষ্ট তার কথা অথচ সে অস্পষ্টতা অতি উগ্র: মানুষের ভাষা নয়, জন্তুর হিংস্র আর্তনাদ। কী? এই সন্ধ্যা না হয় অচেনা সন্ধ্যা হলো: রূপকথার সন্ধ্যাও তো সন্ধ্যা, কিন্তু তবু সন্ধ্যা, আর এ-সন্ধ্যায় তুমি আমাকে নির্মমভাবে কন্টাকাকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ? কে তুমি, তুমি কে? জানো সারাআকাশ আমি বিষাক্ত রুদ্ধ জিহ্বা দিয়ে চাটবো। চেটে-চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাবো সে আকাশ দিয়ে-কে তুমি, তুমি কে?

আমুর সমস্ত মন স্তব্ধ এবং নুয়ে রয়েছে অনুতপ্ত অপরাধীর মতো। সে ক্ষমা চায়; শক্তিশালীর কাছে সে ক্ষমা চায়। যেহেতু শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সে ন্যায়ের প্রতি অন্যায় করা গুরুতর পাপ। সে পাপ করছে, এবং তাই সে ক্ষমা চায়: দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। চারধারে তো রাত্রীর ঘন অন্ধকার, শক্তিশালীর ক্ষমা করার কথা জানবে না কেউ।

ওধারে কুকুরে কুকুরে কামড়াকামড়ি লেগেছে। মনের এ পবিত্র সান্ত্বনায় সে কোলাহলের তীব্র আওয়াজ অসহনীয় মনে হলো বলে হঠাৎ আমু দূর দূর বলে চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর জানালো যে ওরা মানুষ, কুকুর নয়! অথবা ভেতরে কুকুর, বাইরে কুকুর নয়।

কিন্তু আমু মানুষ, ভেতরে বাইরে মানুষ। সে মাপ চায়। কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ উঠে পড়লো, তারপর অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিসের সন্ধান যেন তাকালো রাস্তার ক্ষীণ আলো এবং দুপাশের স্বল্পালোকিত জানালাগুলোর পানে।

দোতলা তেতলা-আরো উঁচুতে স্বল্পালোকিত জানালা ধরা-ছোয়ার বাইরে। তুমি কি ওখানে থাক?

তারপর কখন মাথায় ধোঁয়া উড়তে লাগলো। এবং কথাগুলো মাথায় ধোঁয়া হয়ে উড়ছে। উদরের অসহ্য তাপে জমাট কথাগুলো ধোঁয়া হয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর গলাটা যেন সুড়ঙ্গ। আমু শনতে পারছে বেশ যে কেমন একটি অতি ক্ষীণ আওয়াজ সে-গভীর ও ফাঁকা সুড়ঙ্গ বেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে আসছে ওপরের পানে এবং অবশেষে বাইরে যখন মুক্তি পেলো তখন তার আঘাতে অন্ধকারে কেউ জাগলো চেউগুলো দু-ধারের খোলা চোখ-ঘুমন্ত বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো তার কানে। মাগো চাট্রি খেতে দাও।

এই পথ, ওই পথ: এখানে পথের শেষ নেই। এখানে ঘরে পৌঁছানো যায় না। ঘর দেখা গেলেও কিছুতেই

পৌঁছানো যাবে না সেখানে। ময়রার দোকানে আলো জ্বলে, কারা খেতে আসে, কারা খায়, আর পয়সা বনবান করে: কিন্তু এধারে কাঁচ। কাঁচের এপাশে মাছি আর পথ আমু। তবু দাড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভেতর থেকে কে একটিলোক বাজের মত খাঁইখাঁই করে তেড়ে এলো। আরে লোকটি অন্ধ নাকি? মনে মনে আমু হঠাৎ

হাসলো একচোট, অন্ধ না হলে এমন করবে কেন? দেখতে পেত না যে সে মানুষ?

পথে নেমে আমু ভাবলে, একবার সে শুনেছিলো শহরের লোকরা অন্ধ হলে নাকি শোভার জন্য নকল চোখ পড়ে। দোকানের লোকটি অন্ধই আর তার চোখে সে-নকল চোখ। কিন্তু একটা আওয়াজ শুনে হয়তো ভেবেছে বাইরে কুকুর, তাই তেড়ে উঠেছিলো অমন করে। কিন্তু সে কথা যাক, আশ্চর্য হতে হয় কান্ড দেখে। নকল চোখে আর আসল চোখে তফাৎ নেই কিছু।

তারপর মাথায় আবার ধোঁয়া উড়তে লাগলো। ময়ুরাক্ষীর তীরে কুয়াসা নেমেছে। স্তব্ধ দুপুর: শান্ত নদী। দূরে একটি নৌকায় খরতালে ঝনঝন করছে আর এধারে শ্মাশানঘাটে মৃতদেহ পুড়ছে। ভয় নেই। মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুকে সে পেরিয়ে এসেছে, আর অনিগলি দিয়ে ঘুরে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েছে। কড়া একটা গন্ধ নাকে লাগছে। কী কোলাহল, লোকেরা আসছে, যাচ্ছে। হোটেল। দাঁড়াবে কি এখানে? দাড়ালে দাড়াতে পারে, তবে নকল চোখ পরা কোন অন্ধ তো নেই এখানে, আওয়াজ পেয়ে তেড়ে আসবে না খাঁইখাঁই করে? কিন্তু গন্ধটা চমৎকার। তারপর বোশেখ মাসের শূন্য আকাশ হঠাৎ যেমন মেঘে ছেয়ে যায়, তেমনি দেখতে না দেখতে একটা ভীষণ কালো ক্রোধে তার ভিতরটা করাল হয়ে উঠলো, আর কাঁপতে থাকলো সে খরখর করে: সিঁড়ির ধারে একটা প্রতিবাদী ভঙ্গিতে সে রইলো দাঁড়িয়ে। অবশেষে ভেতর থেকে কে চেষ্টা করে উঠলো, আরেকজন দ্রুতপায়ে এলো এগিয়ে, এসে হীনভাষায় কর্কশ গলায় তাকে গালাগালি দিয়ে উঠলো। এই জনোই আমু প্রস্তুত হয়ে ছিলো। হঠাৎ সে স্ফিগের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর, এবং তারপর চকিতে ঘটিত বহু ঝড় ঝাপটার পর দেহে অসহ্য বেদনা নিয়ে আবার যখন সে পথ ধরলো, তখন হঠাৎ কেমন হয়ে একবার ভাবলে: যে-লোকটা তাড়া করে এসেছিলো সে-ও যদি ময়ূরার দোকানের লোকটার মতো অন্ধ হয়ে থাকে? হয়তো সে-ও অন্ধ, তার-ও চোখ নকল। শহরে এত-এত লোক কি অন্ধ? বিচিত্র জায়গা এই শহর!

চাকল্যকর ঘটনার পর উত্তেজিত মাথা ঠাণ্ডা হতে সময় নিলো এবং সে উত্তেজনার মধ্যে কোন রাস্তা হতে কোন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে হঠাৎ একসময়ে সে থমকে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে ভাবলো: যে পথের শেষ নেই, সে পথে চলে লাভ নেই, বরঞ্চ ওই যে ওখানে কে কঁকাছে সেখানে গিয়ে দেখা যাক কী হয়েছে তার। ফুটপাথের ধারে গ্যাসপোস্ট, তার তলে আবছা অন্ধকারে কে একটা লোক শুয়ে রয়েছে, আর পেটে হাত চেপে দূরন্ত বেদনায় গোঙাচ্ছে। তার একটু তফাতে যে কয়টা লোক উবু হয়ে বসে রয়েছে তাদের মুখে কোন সাড়া নেই, শুধু তারা নিঃশব্দে ধুঁকছে। আমু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর আপন মনে থমকে ভাবলো, ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। সে কেন যাবে তাদের কাছে, যাবে না। তারপর কেমন একটা চাপা ভয়ে সে যেন ভাঙা পা নিয়ে পালিয়ে চললো। কী যে সে ভয় সে কথা সে স্পষ্ট বলতে পারবে না এবং সে কথা জানবারও কোন তাগিদ নেই শুধু যেন কেমন একটা ভয় হতে মুক্তি পাবার জন্যে সে পালিয়ে যাবে সে-রাস্তা দিয়েই, যে রাস্তার কোনো শেষ নেই। যে ছায়া ঘনিয়েছে মনে, তারও কী শেষ নেই? আর সে ছায়া কী মৃত্যুর?

অনেকক্ষণ পর তার খেয়াল হলো যে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, আর তার গলার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেয়ে-বেয়ে উঠছে ওপরের পানে এবং যখন সে আর্তনাদ শুন্যতায় মুক্তি পেলো, রাত্রির বিপুল অন্ধকারে মুক্তি পেলো, অত্যন্ত বিভৎস ও ভয়ঙ্কর শোনালো তা। এ কি তার গলা-তার আর্তনাদ? সে কি উন্মাদ হয়ে উঠেছে? অথবা কোনো দানব কি ঘর নিয়েছে তার মধ্যে? তবু তবু তার মনের প্রবল উপেক্ষা করে সুড়ঙ্গের মতো গলা বেয়ে তাক্ষ, তীর, বিভৎস আর্তনাদের পর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগলো, আর সে খরখর করে কাঁপতে লাগলো আপাদমস্তক। অবশেষে দরজার প্রাণ কাঁপলো, কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো, এসে অতি আস্তে আস্তে অতি শান্ত গলায় শুধু বললে: নাও।

কী? কী সে নেবে? ভাত নেবে। ভাতই কি সে চায়? সে ভাতই চায়: এ দুনিয়ায় চাইবার হয়তো আরও অনেক কিছু আছে, কিন্তু তাদের নাম সে জানে না। ব্রহ্মভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিলে,

নিখে মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত নিঃসলক চেয়ে রইলো মেয়েটির পানে। মনে হঐছে যেন চেনা-চেনা। না হলে সে  
চোখ ফেরাতে পারবে না কেন!  
নয়নচারী গ্রামে কি মায়ের বাড়ি?  
মেয়েটি কোনো উত্তর দিলে না। শুধু ংকটু বিস্ময় নিয়ে কয়েকমুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে দরজা বন্ধ করে  
দিলো।